মুক্তিনাথের দুর্গম পথে

নন্দিতা বসাক

এই স্থানটির নাম একলাবাড়ি। নেপাল হিমালয়ের মুসটাঙ জেলায় কালীসপ্তমী নদীর তীরে। নির্জন এই স্থানে আমরা এসেছি একরাতের জন্য। হোম স্টে-র ব্যবস্থা। দুরে দেখা যায় নদীর ভ্যালিতে জনপদ, নাম কাগবেণী। এবং ডানদিকে পাহাড়ের গায়ে সরু পথটি উঠে গেছে। পায়ে হেঁটে বা ঘোড়ায় যেতে হবে এইপথে। নয় হাজার ফিট উচ্চতায় দুর্গম পাহাড়ের কোলে মুক্তিনাথ তীর্থ। বহু দেশি বিদেশি পর্যটক ও পুণ্যার্থীর যাত্রা সে পথে। শীতল মরুভূমি অঞ্চল। জনবিরল, গুল্ম ও কাঁটা জাতীর সামান্য গাছপালা চোখে পড়ে। পথপাশে পাহাড়ের খাঁজে কখনও তিরতির জলের রেখা। পার্বত্য ঝর্ণা যেখানে পথ খুঁজেছে সেখানেই গড়ে উঠেছে বসতি, ঘরদুয়ার, সামান্য চাষ। এপথে, গ্রাম শুরু হবার আগে একটিই বাড়ি ছিল দৃশ্যমান। তাই নাম একলাবাড়ি। পোখরা থেকে ছোটো ১৬ সীটের প্লেনে অন্নপূর্ণা শৃঙ্গমালা পার হয়ে তিব্বতের সীমানার কাছে এই স্থানে এসেছি। এই স্থানের জেলাসদর হল 'জমসম' শহর। সেখান থেকে ঘোড়ায় তিন ঘন্টার পথ একলাবাড়ি। আজ এখানেই রাত্রিবাস। আমাদের এবং আমাদের ঘোড়াদেরও বিশ্রাম এখানে। জমসম এদিককার পরিচিত শহর। তুষারাবৃত শিখরমালা পেরিয়ে হিমবাহের অনৈসর্গিক দৃশ্য দেখতে দেখতে আসা যায়। আবার, পোখরা থেকে পাহাড়ি গ্রামের মধ্য দিয়ে ঘোড়া বা ট্রেকারের পথও আছে। সময় ও পরিশ্রম ও পথে বেশি। তবে বিদেশি ট্রেকারদের স্ব-ইচ্ছাতে ওই পথে পাহাড়ে ওঠেন। জমসম শহরে সব রসদ আসে পাহাড়ের ওপার হতে, বিমানযোগে। মাসুল তাই লাগামছাড়া। হিমাচল বা কুমায়ুনের হিমালয়েরর শ্যামশ্রী আমাদের চোখ জুড়িয়ে দেয়। এই অঞ্চলের রুক্ষ শ্যামলতাহীন চিত্র নিসর্গের আরেক রূপ খুলে দেয় আমাদের সামনে। এ রূপেরও আকর্ষণ আছে। শীতল মরুর ভয়াল রূপের আকর্ষণ। কালীগণ্ডকী নদী তিব্বতের পাহাড় থেকে বয়ে আনছে কালোজলের রাশি। নানা ধাতব চূর্ণের উপস্থিতি কালোরঙের কারণ হতে পারে। কথিত, মুক্তিনাথের পথে কালো নদীর বালুতটে স্বর্ণরেণু মেশানো আছে। আর আছে অ্যামোনাইট ফসিল, মানুষের আকারে। কখনও পাথরের গায়ে আঁকা রয়েছে চক্রের ছাপ। কোটি বছর আগে পৃথিবীর বুকে এই প্রাণ জেগে ছিল। এখন তার অংশটুকু আছে ফসিল হয়ে। টেথিস সাগর থেকে হিমালয়ের উৎপত্তি হওয়ার ফলে কিছু কিছু জলজ প্রাণীর দেহাবশেষ এখনও চোখে পড়ে। অ্যামোনাইট পাথরের একটি বিশেষ রূপ শালগ্রাম শিলারূপে পরিচিত। কথিত আছে গণ্ডকী নারায়ণকে পুত্ররূপে লাভ করার জন্য সহস্রাধিক বৎসর কঠোর তপস্যা করেছিলেন। নারায়ণ তাকে বর দিয়ে এই বলেন যে, শালগ্রাম রূপে গণ্ডকীর গর্ভে তিনি অবস্থান করবেন। গণ্ডকীর একটি ধারা জঙখোলা নামে মুক্তিনাথ পাহাড় থেকে এসে কাগবেণীতে মিলিত হয়েছে নারায়ণী নদীর সঙ্গে। কাগবেণী তাই পুণ্যতীর্থ। এই সংগম হংসতীর্থ নামেও পরিচিত।

এ অঞ্চলের অধিবাসীদের আচার ব্যবহার বেশভূষণ তিব্বতী প্রভাব খুব বেশি। এই বাড়িটির সামনের ঘরগুলি অতিথিদের জন্য রক্ষিত। পিছনে

নিজেদের বসবাস। সামনের উঠোনে একটি চোরটেল। বাড়ির মৃতা গৃহিণীর সমাধি সেটি। এরা নানান ধর্মীয় আচারে বিশ্বাসী, কুসংস্কারের প্রভাব প্রচুর। রাতে মন্ত্রধ্বনির সঙ্গে দামামা বাজিয়ে অশুভ আত্মা বিতাড়নের অনুষ্ঠান হল। আমরা ট্যুরিষ্টরা ৩/৪টি ঘর নিয়ে আছি। পাহাড়ি ও দুর্গমস্থানের অনুপাতে থাকার ব্যবস্থা ভালোই। জানালা দিয়ে নদীর কালোজল, ওপারের খাড়া পাহাড় চোখে পড়ে। মানুষজন একেবারে অমিল। একলাটি নদীর তীরে দাঁড়িয়ে এই বাড়িটি। এগারোটায় এসে পৌঁছোনোর পর একবারই নদীতীরে যাওয়া হয়েছিল। কেউ কেউ শালগ্রাম সন্ধান করলেন। আমাদের নিছক কৌতূহল। উত্তরদিক থেকে আসা প্রচণ্ড ধূলিঝড় প্রায় আছড়ে ফেলতে কোনোক্রমে চলে আসি বাড়ির মধ্যে। সকাল এগারোটার এই ধূলিঝড় প্রত্যহ আসে। তখন বাইরে থাকা নিরাপদ নয়। তারা আগে যাত্রা শুরু করে এ স্থান ছেড়ে যেতে হয়। সরু পাহাড়ি পথে যাত্রীদের ওঠানামা দূর থেকে দেখে গা ছমছম করে উঠল। রাতটা কাটিয়ে ও ক্ষুন্নিবৃত্তি করে সকালেই আমরা রওনা হই মুক্তিনাথের পথে। নদীর গতিপথ ছেড়ে আমরা ডানদিকে সরু চড়াই ধরে এগোই পাশেই গিরিখাত। কোথাও খুব সংকীর্ণ স্থানে পৌঁছোই। পাহাড়ের পিছনে তুষার তীর্থ উঁকি দেয়। একটি চটি পথের পাশে কোনোক্রমে যেন দাঁড়িয়ে। যথেষ্ট অপরিষ্কার। দরজায় ইয়াকের মাথা ঝুলছে। সিনেমায় দেখা, আঠারোশো শতকের মধ্য এশিয়ার চিত্র চোখের সামনে ভাসে। আমাদের পরিচিত জগতের সঙ্গে কোনো মিল নেই। দেওয়ালের মতো পাহাড় মাথা ঝুঁকে যেন হঠাৎ এসে পড়া যাত্রীদের কার্যকলাপ নিরীক্ষণ করছে। ভয় হয়, হঠাৎ বুঝি ধ্বসে পড়বে ওই পাথরের দেওয়াল। গ্রাস করবে সৃষ্টিকে। এই স্থান পার হয়ে গেলে আবার অবাধ সূর্যকিরণ ও গিরিখাত দৃশ্যমান হয়। কিছুদূরে সরু একটি জলধারা। পথের দুদিকে কিছু সজীবতা চোখে পড়ে। দু-একটি পর্ণকুটির। লোকের জীর্ণ বেশবাস ও শিশুদের শরীরস্বাস্থ্য থেকে দারিদ্র্যের চিহ্ন প্রকট। আরও ওপরে উঠে একটি জনপদের আভাস,, কিছু ঘরবাড়ি। বাড়িগুলি শ্রীছাদ নেই। বারান্দা চোখে পড়ে না। শুনি এই স্থানের নাম বারকোটি, বারগ্রাম নামে পরিচিত অঞ্চলের জমিদারের বসত ছিল একসময়। এরপরে মুক্তিপথের শেষ চড়াই। মন্দিরকে কেন্দ্র করে কিছু হোটেল, ঘরবাড়ি। শেষ অংশটুকু ঘোড়া ছেড়ে পায়ে হেঁটে যাওয়া। বরফঢাকা পাহাড়ের কোলে মন্দিরের সীমা চোখে পড়ে। মন আনন্দে ভরে যায়। ধীরে ধীরে শ্বাসকষ্টের অসুবিধা অতিক্রম করে ওপরে ওঠা হয়। ধীরাদি, পোদ্দার মাসিমার সাথে আগে পরে সকলেই ওপরে পৌঁছোই। চারিদিকে বরফচূড়া চোখে পড়ে। এই স্থানের সৌন্দর্যকে ভাষায় বর্ণনা করা দুঃসাধ্য। হেমগিরি রৌদ্রস্নাত হয়ে সকলকে আবাহন জানায়। মন্দিরটি ছোটো গাছপালা ও গুল্ম দিয়ে ঘেরা। বড়ো প্রাঙ্গণটিকে ঘিরে পাহাড়ি ঝর্ণার নিয়ন্ত্রিত জলধারা অবিরল বয়ে চলেছে। ছোটো ছোটো নলের মুখে জলধারাকে বহানো হয়েছে। এই ধারাও গণ্ডকীর উপনদীতে মিশেছে। কেউ কেউ বরফগলা জলে স্নানাদি সেরে, তুলসী ও ফুল দিয়ে বিগ্রহের পুজো করেন। রক্তাম্বর পরিহিতা এক রমণী। মূর্তিটি সুন্দর, সম্ভবত পিতলের। কেউ বলেন বুদ্ধ, কেউ বলেন বিষ্ণু। সব মানুষের জন্যই এই দুর্গমতীর্থ। প্রণাম করে এক অপার্থিব আনন্দ নিয়ে বাইরে আসি।

উমাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়-এর লেখায় জানা যায়, এই তীর্থের উল্লেখ পুরাণে আছে। তবে বর্তমান মূর্তিটি ও দুইপাশে শ্রীদেবী ও ভূদেবীর মূর্তি। আনুমানিক দেড়শো বছর আগে নেপালের কোনো রাজা করিয়েছিলেন। চারিপাশের দেবত্র জমি, গাছপালা, বাগান, সব তাঁরই ব্যবস্থাপনায়। আগে, মহারাজ বীরেন্দ্রও ব্যতিক্রম নয়।

মুক্তিনাথ মন্দির থেকে আরেকটু উপরে আছে জ্বালাদেবীর মন্দির। একটি পাহাড়ি গুহা। ভিতরে তিব্বতী গুম্ফা। ফাটলের ভিতর থেকে জলস্রোত

বয়ে আসছে। আর কী আশ্চর্য। সেই সঙ্গে দৃশ্যমান হচ্ছে লকলকে আগুনের শিখা। জল-আগুনের পাশাপাশি এই স্থানের মাহাত্ম্য ও রহস্য বেড়েছে। ভূগর্ভের কোনো বিশেষ গ্যাস নির্গমনের ফলেই এমনটা হচ্ছে। জল-অগ্নির একত্রবাসের উল্লেখ পুরাণে পাওয়া যায়। অগ্নি, দেবাদিদেব শংকরের ও অমৃতবাণী জল, বিষ্ণুর প্রতিভূ মনে করা হয়। পুরাণে এই মন্দিরের উল্লেখ নেই। তবে হিমালয়ের দুর্গম মুক্তিনাথ তীর্থের ভৌগোলিক ও প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্য বর্ণিত আছে। উল্লেখ আছে গুপ্তধারা পাতালগঙ্গার। মাটির নীচে জল বয়ে যাওয়ার কুলুকুলুধ্বনি কেউ কেউ শোনেন। এই দুই মন্দির। সেই সঙ্গে গাণ্ডকী নদীতে শালগ্রামশিলার অস্তিত্ব। সব মিলিয়ে মুক্তিনাথ তীর্থের বিশেষ আকর্ষণ।

মন্দির দর্শনের পর আশ্রয়ের সন্ধান চলে। হোটেল 'মুক্তিনাথ'-এ আমাদের ট্যুরগাইড বুকিং করিয়েছিলেন। সেখানে আজকের মতো বিশ্রাম। রাস্তার কষ্ট কম নয়। সহযাত্রীদের মধ্যে শ্যামল, তনুশ্রী, নির্মলবাবু পুরোপথ ট্রেকিং করে এসেছেন। তাঁদের সাথী হয়েছে হাই অলটিচুড সিকানস। অক্সিজেন কম থাকার কারণে মাথাধরা, বমি, শারীরিক অস্বস্তি নিয়ে কেউ কেউ শয্যা নিলেন। ১২৫০০ ফিটের উচ্চতায় দুর্গম অঞ্চলের তুলনায় থাকার হোটেলটি ভালোই ব্যবস্থা। মাঝখানে বড়ো খোলা উঠোনের দুইদিকে টানা বারান্দার পাশে ছোটো ছোটো ঘর। আসবাব বলতে মামুলি তক্তপোস। তবে স্থানমাহাত্ম্যের কারণে অসুবিধা গ্রাহ্য হয়না। সামনেই দৃশ্যমান অনন্ত আকাশের নীচে মহামহিম হিমালয়ের তুষারচূড়া। এই অংশে দেখা যায় ধবলগিরি বা ধৌলি যাত্রার প্রথম অংশে দেখেছি অন্নপূর্ণা শৃঙ্গমালা, নীলগিরি পর্বত। ক্লান্তিতে, সাদামাটা শয্যায় ঘুম আসতে দেরি হয়না। তবে ক্ষুন্নিবৃত্তির ব্যবস্থা ছিল কিঞ্চিৎ কষ্টকর। এখান সব হোটেলেই দেশিবিদেশি সুরার যত চমকপ্রদ সম্ভার, তুলনায় আহার্য তেমন সহজলভ্য নয়। একমাত্র সহজপ্রাপ্য খাবার নুডলস সিদ্ধ। দু-একটি সবজি যা চোখে পড়ে সব দু-এক সপ্তাহের পুরোনো স্টক। পোখরা ছাড়ার আগে ট্যুর গাইড আমাদের নৈশআহারে এলাহি ব্যবস্থা রেখেছিলেন কেন, তার অর্থ কিছুটা বোঝা গেল। বোধহয় পরের তিনদিন অর্ধাহারের কথা মাথায় রেখে ওভারেলোডের ব্যবস্থা হয়েছিল।

পরদিন সকাল ন'টায় আমাদের ফিরতি পথের যাত্রা শুরু। যাবার পথের যে কৌতূহল অজানাকে দেখবার তা এখন অনুপস্থিত। তবে তীর্থদর্শন ও হিমালয় ভ্রমণের আনন্দে মন ভরপুর। আবার একলাবাড়ি এসে সামান্য আহার ও বিশ্রাম। তারপর যাত্রা জমসমের দিকে। সেখানে একরাত কাটিয়ে ছোট প্লেনে পোখরা। সেখানে আমাদের পরিচিত জগৎ। জনহীন রুক্ষ পাহাড়, বালুচরের প্রবল ধূলিঝড়, দানবপ্রকৃতি পাহাড়ের পিছনে ধৌলির তুষার পিছনে পড়ে থাকে। শহর জীবনের স্বাভাবিক ছন্দকে ফিরে পেয়ে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলি। পাহাড়ে ওঠার আনন্দ এক, আর পাহাড় থেকে নেমে চেনা পৃথিবীকে ফিরে পাওয়ার আনন্দ আর এক। আমরা পিছনে ফেলে এসেছি শালগ্রাম শিলার দেশ, গণ্ডকীর কালোজল, তুষারঘোর মুক্তিনাথ উপত্যকা। সেই সঙ্গে নেপালের অধিবাসীদের কষ্টকর জীবনের অভিজ্ঞতা। মনে দাগ কেটে রয়েছে কষ্টের মধ্যেও পাহাড়ি মানুষের অনাড়ম্বর আন্তরিক ব্যবহার আর তাদের সরল হাসিমাখা দৃষ্টি। সেটুকু কখনও ভোলার নয়।